মৈত্রীশ ঘটক

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়

কয়েকমাস আগে অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। জেএনইউ-এর ছাত্র আন্দোলন (যার থেকে ছাত্রনেতা হিসেবে কানহাইয়ার নাম ছড়িয়ে পড়ে) প্রসঙ্গে তিনি বললেন, মোটের ওপর যদিও উনি বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তবু রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগানকে (কাশ্মীরের আজাদি নিয়ে যা তোলা হয় বলে অভিযোগ) উনি বৈধ বলে মনে করেন না।

আবার এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই বিজেপি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাল যোগী আদিত্যনাথ-কে, যাঁর প্ররোচনামূলক অগ্নিগর্ভ বাণীতে বিকাশের থেকে বিনাশের বার্তা অনেক প্রকট। দেশের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে স্লোগান উঠলে সেটা কারোর স্বদেশবিরোধী মনে হতেই পারে, কিন্তু দেশের সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাকিদের উস্কে দেওয়া কি পরম দেশাত্মবোধের কাজ?

বাক্‌স্বাধীনতা ব্যাপারটাই এমন যে সবারই নিজের পছন্দের কথার ক্ষেত্রে, তার প্রতি প্রবল আনুগত্য, আবার ঘোরতর অপছন্দের কথা কেউ বললে ''বাক্‌স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে'' গোছের অনুভূতি হয়। আর, আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলই গদিতে বসার পরে বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি বিরোধী দল হিসেবে যে প্রেম, তা বজায় রাখতে পারেনি। তবে, সেই আদর্শ থেকে কে কতদূর ভ্রষ্ট হয়েছে তার নিরিখে বিভিন্ন দলের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য আছে—মোদী জমানায় এই বিতর্ক যত প্রবল হয়েছে, তার তুলনা অন্তত সাম্প্রতিক কালের স্মৃতিতে মনে পড়ে না, এমনকি, বাজপেয়ী সরকারের আমলেও না। আবার একই দলের বিভিন্ন জমানার মধ্যেও প্রচুর তফাত যেমন, সোনিয়া গান্ধী-মনমোহন সিং জমানার কংগ্রেস আর ইন্দিরা-সঞ্জয় গান্ধী জমানার কংগ্রেসের মধ্যে।

বাক্‌স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সমাজে যে ধরনের তর্কবিতর্ক ও পারস্পরিক দোষারোপের পালা চলতে থাকে তার থেকে আন্দাজ করা যায় যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের ধারণা কিছুটা অস্পষ্ট। এর মূলে রয়েছে একটা শব্দের দু'রকম ব্যাখ্যা। ইংরেজির 'free speech' বা বাক্‌স্বাধীনতা, বা আরো খুলে বললে, ''মতপ্রকাশের অবাধ অধিকার'' কথাটাকে যেন আমরা দু'রকম তর্জমা করেছি। এক হল নিজের মতামত ব্যক্ত করার অবাধ অধিকার, আরেক হল বিনা মূল্যে বা পরিণামে যা খুশি তাই বলতে পারার ক্ষমতা।

ব্যক্তিগত স্তরে প্রথম অর্থ ধরে বলা যেতে পারে, আমার যেমন মতপ্রকাশের পূর্ণ অধিকার আছে, তেমন অপর পক্ষেরও সমান অধিকার আছে আমার কথায় কান না দেওয়ার। সুতরাং কেউ আমার কথার জবাব না দিলে, আমার সাথে আলোচনায় বসতে না চাইলে, বা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে সেটা কখনোই আমার বাক্‌স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ বলে দাবি করতে পারি না। তাই ব্যক্তিগত স্তরে আমার বাক্‌স্বাধীনতার স্বাভাবিক সীমা হল আরেকজনের সহনশক্তির সীমা।

দ্বিতীয় অর্থেও ব্যক্তিগত স্তরে বাক্‌স্বাধীনতার স্বাভাবিক সীমা আছে। ব্যক্তিগত আলাপে আমি কি বলছি তা কখনোই পুরোপুরি মূল্য বা পরিণামরহিত নয়। আমার পরিচিত কাউকে যদি আমি বাক্যাঘাত করি, তাতে হয়তো আমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার কোনো প্রভাব আমাদের ভবিষ্যৎ সংস্পর্কের ওপরে পড়বে না এমন আশা করা বাতুলতা।

এই মতপ্রকাশের মূল্য দেবার ব্যাপারটা সবচেয়ে পরিষ্কার করে বোঝা যায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কে। কোনো-এক রোদ ঝলমলে সকালে টিভির আবহাওয়াবিদের কী খেয়াল হল, তিনি ঘোষণা করে বসলেন যে আজ বৃষ্টিতে সবকিছু ভেসে যাবে। করতেই পারেন, কারণ মতামত প্রকাশের অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে টিভি চ্যানেলটিরও যথেষ্ট অধিকার আছে তাঁকে বরখাস্ত করার, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে। অবশ্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস বিষয়টাই এমন গোলমেলে যে এলোপাথাড়ি বাতাস বওয়ার দোহাই দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু ধরুন অঙ্কের মাস্টার যদি ক্লাসে শেখাতে শুরু করেন যে দুই আর দুইয়ে কখনো-বা পাঁচ হলেও হতে পারে—বলতেই পারেন, কারণ এও এক ধরনের ব্যক্তিগত মতামত—তাহলে স্কুল কর্তৃপক্ষেরও নিশ্চয়ই অধিকার আছে তাঁকে মানে মানে অন্য চাকরি খুঁজে নিতে বলার।

একইভাবে, কোনো বেসরকারি টিভি চ্যানেল তাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে কোন পন্থীদের এনে বসাবে তা একেবারেই তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, এবং সাধারণত দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এতে কিন্তু বিরুদ্ধপন্থীদের বাক্‌স্বাধীনতা মোটেই খর্ব হলো না। তারা অন্য চ্যানেলে গিয়ে গলা ফাটাক না, কেউ তো বারণ করেনি। সেরকম ব্যক্তিগত মালিকানার কোনো কাগজ বা পত্রিকা কোনো বিশেষ মতবাদের লেখা না ছাপালে সেটা বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব হওয়া নয়, কারণ অন্য কোনো কাগজ বা পত্রিকায় সে লেখা ছাপানো যেতেই পারে।

কিন্তু এখানেও দেখব যে অবাধ অধিকার মানেই তা নিখরচায় ফলানো যাবে, এমনটা নয়। একপেশে বক্তা বেছে নিয়ে আসার যে দাম টিভি চ্যানেলটি দেবে তা হল জনগণের চোখে মার্কামারা হয়ে যাওয়া। ভারতীয় গণমাধ্যম চিরকালই একটু বাম-উদারপন্থী, এও সবার জানা। অবশ্য ইদানীং একদল দক্ষিণপন্থী টিভির পর্দায় মুখে ফেনা তুলে এমন চিৎকার করছে যে ভয় হয় এই বুঝি দম আটকে একটা কেলেঙ্কারি হল,

যেমন রিপাবলিক বা টাইমস নাউ চ্যানেল। এরা যে মোদী সরকারের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট সেটা অল্প একটু দেখলেই বোঝা যায়, যেমন বোঝা যায় এনডিটিভি মোদী সরকারের সমালোচক।

মোদ্দা কথা, দর্শকের জ্ঞানের নাড়ি যতক্ষণ কাজ করছে ততক্ষণ মিডিয়া যেমন খুশি দলবাজি করুক, ক্ষতি নেই। দর্শক জেনেশুনেই কোন চ্যানেল দেখবেন, কোন কাগজ পড়বেন ঠিক করবেন। তবে সরকারি চ্যানেল বা সংবাদপত্র হলে এই যুক্তিটা খাটে না, কারণ তা করদাতার অর্থে চলে এবং সেখানে বিভিন্ন নাগরিকের মত যাতে প্রতিফলিত হয় সেটা সরকারের গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। কিন্তু তাই বলে বেসরকারি সংবাদমাধ্যমগুলি নিজেদের গায়ে নিরপেক্ষতার তকমা আঁটার চেষ্টা করলে ব্যাপারটা হাস্যকর হবে—মতাদর্শগত পক্ষপাতের এটুকু খেসারত তো দিতেই হবে। মার্কিন দেশের দক্ষিণপন্থী ফক্স নিউজ চ্যানেলের স্লোগানই হল তারা নিরপেক্ষ ও সমদর্শী, কিন্তু কেউই সে কথা বিশ্বাস করে না, বরং সেটা নিয়ে হাসাহাসিই করা হয়।

অবশ্য খেয়াল রাখার দরকার, তথ্য ও মতামত যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে না যায়। আমার মতে আমার নিজের শহরটা হল থাকার পক্ষে পৃথিবীর সেরা জায়গা—ভাবতেই পারি, মত পোষণ করতে তো কেউ বারণ করেনি। কিন্তু আমি যদি তথ্য বিকৃত করে ও ভুল পরিসংখ্যান দিয়ে আমার মতটাকে খবর হিসেবে ছেপে দিই, তাহলে অসুবিধে আছে। ব্যক্তির সামাজিক সম্মান রক্ষা করার জন্য মানহানির আইন রয়েছে। আমি যদি কাউকে অপছন্দ করি, সে কথা জনসমক্ষে বলতে বাধা নেই। কিন্তু সে লোকটি অমুক জঘন্য কাজ করেছে বা অমুক কুকথা বলেছে, এমন দাবি করতে পারব না, যদি না আমার কাছে সেই কুকর্মের প্রমাণ থাকে। অর্থাৎ প্রমাণ হাতে না থাকলে বিনামূল্যে যা খুশি তাই বলতে পারা যায় না, ক্ষতিপূরণের ভয় আছে।

ভুয়ো খবর কিন্তু বাক্‌স্বাধীনতার আইন দ্বারা রক্ষিত নয়, কারণ সেটা খবর তা তথ্য হিসেবে ছাপা হচ্ছে, মতামত হিসেবে নয়। এর সঙ্গে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে ভুসিমাল বেচা অথবা অন্যভাবে লোক ঠকিয়ে টাকা করার কোনো পার্থক্য নেই। মতপ্রকাশের অধিকার সবার আছে, কিন্তু অবাধে ঠগবাজি করার ছাড়পত্র কারোরই নেই। আবার কারোর স্বাধীন মতামত যদি দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে অথবা গণনিরাপত্তার পরিপন্থী হয়ে ওঠে, তাহলে সেটাও আইনের রক্ষাকবচের আওতায় থাকে না।

তবে, বাক্‌স্বাধীনতার সীমা নিয়ে এ সমস্ত আলোচনার ভিত্তি হল এক নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক বিচারকের, খেলার আম্পায়ার বা রেফারির মতো যিনি সৎ এবং একনিষ্ঠভাবে নিয়মের প্রয়োগ করবেন।

২

আইনের শাসন বলবৎ হতে গেলে আইন প্রয়োগকারী কোনো এক নিরপেক্ষ বিচারক শক্তির অস্তিত্ব অবশ্যপ্রয়োজন, যা আইন প্রয়োগ করবে এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আইনগত অধিকার রক্ষা করবে। এই ভূমিকা সচরাচর পালন করে রাষ্ট্র এবং এই কারণেই রাষ্ট্রের অধিকার আছে নিয়মলঙ্ঘনকারীকে বলপূর্বক নিরস্ত করার, অথবা কারারুদ্ধ করার। কিন্তু সেই ক্ষমতা ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানের নেই। তারা বড়জোর বেয়াদব কর্মচারীকে ছাঁটাই করতে পারে, অথবা বেয়াড়া যোগানদার বা খদ্দেরের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করতে পারে।

এইজন্যই রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে বাক্‌স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। যথেষ্ট আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং দায়বদ্ধতার অভাবে গণতন্ত্র সহজেই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হতে পারে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তফাত দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি পরস্পর- নির্ভরশীল নীতির ওপরে। এক হল, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যের সম্পর্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রকে। এবং দুই হল, সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের অধিকারও দিতে হয়েছে। আমি যদি আজ মনে করি যে এনডিটিভি দিনে দিনে বড্ড একপেশে হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কাল থেকে তাদের চ্যানেল না দেখলে বা ওয়েবসাইটে না ঢুকলে কারোর কিছু বলার নেই। কিন্তু একইভাবে আমি রাষ্ট্রকে বর্জন করতে পারি না, কারণ সরকারকে অমান্য করার অভিযোগে আমার শাস্তি হতে পারে।যেমন, সরকার যদি বলে আধার কার্ড না করালে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা থেকে শবদাহ কোনো কিছুই আর করা যাবে না, দেশত্যাগ করা ছাড়া সেটা অমান্য করার উপায় আমাদের নেই।

আর সব অধিকারের মত, যতই জরুরি হোক, বাক্‌স্বাধীনতা কোনো জায়গায় সহজে বিকশিত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ। নইলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা কাজ করে না, এবং আইনের শাসন মুলতুবি হয়ে দেশটা মগের মুল্লুকে পরিণত হয়।

কে কোথায় কোন উস্কানিমূলক কথা বলল তাই নিয়ে বারবার উত্তেজিত না হয়ে আমাদের বরং উচিত দেশের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির প্রতিবাদ করা, কারণ প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছি যে খুনি, ধর্ষক ও দাঙ্গাবাজরা দলে দলে বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর আইনব্যবস্থা কোনোমতেই আদর্শ নয়, তবু চরম অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে আইনব্যবস্থা যে তৎপরতা দেখায় তা শিক্ষণীয়। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্‌সাসে ট্রাম্প জেতার পরেপরেই জাতিবিদ্বেষমূলক আক্রমণে যখন দক্ষিণ-ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হল, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপরাধী ধরা পড়ল, এবং আপাতত সে আইনব্যবস্থার জঠরে যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে

অগ্রসর হচ্ছে। গুজরাটের দাঙ্গায় আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েও কিন্তু একাধিক ব্যক্তি (যেমন, প্রাক্তন মন্ত্রী মায়া কোদনানি) গত কয়েক বছরে ছাড়া পেয়ে গেছেন।

আইনের শাসন যেখানে কার্যকর, সেখানে পরের ধাপে গিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে গণতান্ত্রিক দেশে বাক্‌স্বাধীনতার ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত কিনা, এবং থাকলেও কতদূর থাকতে পারে। গোঁড়া সমর্থকরা সাধারণত বর্জন করার অধিকারের ওপরে জোর দেন—কোনো একটা বই তোমার পছন্দ না হয়, পোড়ো না। বিরোধীরা বলেন, ইচ্ছে করলেই তো সবসময় সবকিছু বর্জন করা যায় না। ভিড়ে ঠাসাঠাসি সিনেমা হলে কেউ হঠাৎ তার বাকস্বাধীনতা প্রয়োগ করে ''আগুন! আগুন!'' বলে চিৎকার করে উঠল। বাকিরা কী ইচ্ছে থাকলেও তার পরিণাম এড়াতে পারবে? বরং অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কায় যে হুড়োহুড়ি হবে, তাতে অনেকের প্রাণসংশয় হতে পারে। এই বিষয়টাতে অবশ্যই সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন।

কিন্তু ভারতবর্ষে আপাতত সমস্যাটা এই জায়গায় নয়। এ দেশে এখন বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে তর্কাতর্কি করাটা ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রপীড়া ঘটানোর সমান। আসল লড়াইটা অন্য জায়গায়—তা হল কিছুটা ভোটের জোরে আর কিছুটা উন্মত্ত জনগোষ্ঠীর গায়ের জোরে বলীয়ান হয়ে ওঠা সরকারের হাতের পুতুল হয়ে যাওয়ার থেকে পুলিশ, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থাকে বাঁচানো। ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের গুন্ডামির হাত থেকে যে স্বাধীনতা আইনের শাসন দ্বারা সুরক্ষিত নয়, সে আসলে কোনো স্বাধীনতাই নয়।

সুতরাং ভারতবর্ষে স্বাধীনতার বড় লড়াইটা এখন এই নিয়ে নয় যে নামীদামি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারা তথাকথিত রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান তুলতে পারবে কিনা, অথবা বিতর্কিত কোনো বক্তাকে মঞ্চে তুলতে পারবে কিনা। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সৈনিকের কন্যাটি 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' বলার ফলে ইন্টারনেটের আড়াল থেকে কামান দাগা দেশপ্রেমিকদের কাছে চূড়ান্ত হেনস্থা হল কিনা, সেটাও আসল কথা নয়। যে শ্রেণী ইদানীং আমজনতার চোখে সবচেয়ে বড় গণশত্রু হয়ে উঠেছে সেই বুদ্ধিজীবীরা অবাধে মুক্তচিন্তার চর্চা করতে পারবেন কিনা বিষয়টা শুধু তাও নয়।

এই প্রত্যেকটি অধিকারই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রক্ষা করা উচিত। কিন্তু শুধু এটুকুই যদি বিষয় হত, তাহলে সেটাকে নিছক অভিজাতদের বিলাসিতা বলে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল। পৃথিবীতে রোজ এমন সব ভয়ানক কাণ্ড ঘটে চলেছে যে সব দেখেশুনে আমাদের চমকে উঠার ক্ষমতাটাই যেন কমে এসেছে। কেউ তাই ভাবতেই পারেন অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করার আছে, সেই তুলনায় এ তো সেরকম বড় কিছু একটা ব্যাপার না। সেই ভাবাটা ঠিক হবে না।

মূল লড়াইটা আসলে বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষার নয়, বরং যে-কোনো কিছু করার স্বাধীনতা রক্ষার—অর্থাৎ, মাৎস্যন্যায়ের কবল থেকে মানুষের মৌলিক অধিকারকে বাঁচানোর, রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার রোখার। বাক্‌স্বাধীনতা এই বৃহত্তর লড়াইয়ের এক প্রাথমিক পর্ব মাত্র।

এই ধর্মের বা ঐ সম্প্রদায়ের মানুষের মনে আঘাত লাগার দোহাই দিয়ে যারা বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করতে চায় তারা সাধারণত আগে সহজ শিকার খোঁজে এবং ক্রমশ মাত্রা চড়াতে থাকে। প্রথম কোপ পড়ে আপনার জিহ্বা ও লেখনীর ওপর। এর পরে নির্ধারণ করা হয় আপনি কী খেতে বা কোন পোশাক পরতে পারবেন, কোন বই পড়তে অথবা কোন ফিল্ম দেখতে পারবেন। তারপর ঠিক করে দেওয়া হবে আপনি কার সঙ্গে মিশতে বা কাকে বিবাহ করতে পারবেন, নির্ভয়ে ভোট দিতে যেতে পারবেন কি না। অথবা ক্ষিপ্ত জনতা যখন আপনার জীবিকার উৎস বা ধর্মস্থান বা বাসস্থান নষ্ট করছে তখন পুলিশ জেগে ঘুমোনোর ভান করবে কিনা। গুজরাট থেকে উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক কোনো ঘটনার সময় পুলিশের ভূমিকা দেখলেই বিষয়টা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

এ সবকিছুর আসল লক্ষ্য হল, চিরকালের নাছোড়বান্দা তর্কবাগীশ ভারতবাসীকে ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে ক্রমশ ম্রিয়মাণ ও আত্মসমর্পিত, পিঠে আধার কার্ড সাঁটা এক বাধ্য ভেড়ার পালে পরিণত করে ফেলা, যারা রাষ্ট্রের নির্দেশে উঠবে ও বসবে, এবং সর্বশক্তিমান সরকার বাহাদুর যখন প্রতিটি প্রকল্পের চূড়ান্ত সাফল্য দাবি করবেন এবং মুহুর্মুহু 'ভারতবর্ষ জাজ্বল্যমান' ধ্বনি তুলবেন তখন কোনোরকম ট্যাঁ-ফোঁ করবে না। এই সুযোগে বিদেশি পুঁজিপতি, পেটোয়া কর্পোরেট ও অন্যান্য ধুয়োধারীর দল উদীয়মান মহাশক্তির নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকবে, এবং যে দুই-একটা দলছুট নিন্দুক কোনোরকম বেয়াড়া প্রশ্ন করবে তাদের চটপট দেশদ্রোহীর কাঠগড়ায় তুলে দেওয়া হবে।

ভারতের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত আসামির সংখ্যা দেখে এবং ক্ষমতাসীন নেতাদের আইনশৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপ করার সুদীর্ঘ ইতিহাস মনে করে ফের যখন শুনি কোনো নেতা বা নেত্রী তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডাদের দুষ্কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণা করেছেন যে আইন আইনের পথেই চলবে, তখন ভরসা পাওয়ার বদলে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসতে থাকে। মনে পড়ে যায় 'দ্য গডফাদার' ছবির সেই দৃশ্য যেখানে মাফিয়া সর্দার ডন কর্লিওনিকে একজন জিজ্ঞেস করেছে অমুককে আপনি এ কাজে রাজি করালেন কী করে, আর তিনি মৃদু হেসে বলছেন 'এমন একটা প্রস্তাব দিলাম, যে না মেনে ওঁর কোনো উপায় ছিল না।' এই গল্পটি যারা জানেন, তাঁদের মনে পড়বে কি ভয়ানক ছিল সেই শাসানি।

সুতরাং সবচেয়ে জরুরি হল দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠান করা। কিন্তু মনে রাখার দরকার যে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকলেও রাষ্ট্র তার বলপ্রয়োগের ক্ষমতার চতুর ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিবাদ জানানোর পথ অতিশয় দুর্গম করে তুলতে পারে, যা কিনা কণ্ঠরোধেরই নামান্তর। সর্বাগ্রে এমন সব কণ্ঠ রুদ্ধ হবে যে আপনি হয়তো সমর্থনই করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন যে সেটা প্রথম ধাপ মাত্র—ক্রমে ক্রমে সবারই মুখ বন্ধ হবে, এবং আপনিও বাদ যাবেন না। তখন আপনার টুঁটি চেপে ধরে বাকি অধিকারগুলো একে একে ছিনিয়ে নিলেও বোবা হয়ে বসে দেখা ছাড়া আপনার গত্যন্তর থাকবে না। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপরে গোঁসা করে আপনি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন। কিন্তু একইভাবে রাষ্ট্রকে বর্জন করার উপায় যেহেতু আপনার নেই, তাই এক্ষেত্রে কোনোমতেই কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হতে দেওয়া যাবে না।

এই কারণে দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। কিন্তু তা না করে আমরা শুধুই পরস্পরকে সন্দেহ করছি আর কাদের দুঃখে কার প্রাণ কাঁদে তাই নিয়ে ঝগড়া করে মরছি। এই দলাদলির ফলে যা হচ্ছে, তা হলো বিভেদের রাজনীতির অনিবার্য পরিণাম—এমন এক খেলা যেখানে কিছু ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী ছাড়া আখেরে হার হয় সব পক্ষের।

৩

কিছুদিন আগের শোচনীয় ঘটনাটির কথাই ধরুন। জুনাইদ খান নামে কিশোরকে দুষ্কৃতীরা ট্রেনের মধ্যে হত্যা করল এবং তার ভাইদের চরম নিগ্রহ করল। কিন্তু মানবাধিকার সুরক্ষিত করার দাবিতে একজোট না হয়ে প্রতিবাদীরা যথারীতি বিষয়টাকে একটা দলাদলির মধ্যে পর্যবসিত করল।

ঘটনাটা ভিড়ের ট্রেনে আসন দখলের লড়াই নিয়ে শুরু হলেও জুনাইদ ও তার ভাইয়েরা যে শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণেই আক্রান্ত হল তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের ও বিদেশের বিভিন্ন শহরে প্রধানত উচ্চবর্গের শিক্ষিত বাম-উদারপন্থী নাগরিকরা প্রতিবাদী পদযাত্রা করলেন, Not In My Name নাম দিয়ে। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের ইন্ধন ছিল না এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল এই বার্তা দেওয়া যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তত একটা অংশ দলিত ও সংখ্যালঘুদের ওপরে বর্ষিত এই নির্যাতনের আচরণের সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রতিবাদীদের উদ্দেশে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা যে সব পাল্টা দোষারোপ নিক্ষেপ করলেন, তার মধ্যে বিশেষ নতুনত্ব কিছু ছিল না। কিন্তু তাহলেও তাদের একটা শ্রেণীবিভাগ করলে এই বিষয়ে আমাদের ভাবনা স্বচ্ছতর হবে এবং বিশেষ উদাহরণ ছাপিয়ে একটা সাধারণ ছক দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রথম আরোপ হল *পক্ষপাতী প্রতিবাদের*। একজন লিখলেন, জনতার আক্রোশ যদি তোমাদের অতই অপছন্দ, তাহলে শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদের সামনে যখন মুসলিম পুলিশকর্মী মহম্মদ আয়ুব পণ্ডিত বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিমদেরই হাতে খুন হলেন তখন তোমরা কোনো আওয়াজ করোনি কেন? প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে Not In My Name প্রতিবাদে মহম্মদ পণ্ডিতের হত্যার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় আরোপ, প্রতিবাদীরা নিজেদের সুবিধামতো *বিকৃত আখ্যান* রচনা করে নিয়ে তার ভিত্তিতে গণ্ডগোল পাকাচ্ছেন। কেউ কেউ বললেন, গণহিংসা খারাপ জিনিস, মানলাম। কিন্তু সে ঘটনা তো রোজই দেশে-বিদেশে কোথাও-না-কোথাও ঘটে চলেছে। তার মধ্যে বিশেষ একটাকে বেছে নিয়ে তার ওপরে রাজনৈতিক রং চড়িয়ে তাকে গোরক্ষা অভিযানের ল্যাজে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা যারা করছে তাদেরনিশ্চয়ই কোনো অভিসন্ধি আছে। আবার একদল বললেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে-কোনো হিংসাত্মক ঘটনার পেছনে সব সময় ঐতিহাসিক কারণ থাকে। সেই ইতিহাসকে বাদ দিয়ে শুধু সংঘাতটুকু দেখলে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে কে আসলে নিপীড়ক আর কে নিপীড়িত।

তৃতীয় অভিযোগ হল প্রতিবাদীদের *নৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা* নিয়ে। এঁরা নিজেরাই বা কী এমন ধোয়া তুলসীপাতা যে নীতির প্রশ্নে অন্যের সমালোচনা করছেন? এ দেশের জাতপাত ও লিঙ্গের ভেদে বহুস্তরীভূত ও জর্জরিত সমাজের মধ্যে তাঁরা হলেন সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চবর্গ। জেনএনইউ-যাদবপুর-প্রেসিডেন্সি ঘরানার শৌখিন বামঘেঁষা রাজনীতি করে করে ওঁরা শিখেছেন শুধু কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী বা মাওবাদীদের মতো জঙ্গি আন্দোলন সমর্থন করতে। যতই অভিনয় করুন, মোটেই ওঁরা মানবাধিকারের প্রশ্নে বিচলিত সাধারণ নিরীহ নাগরিক নন।

শুধু এই প্রতিবাদ মিছিল নয়, সমধর্মী যে-কোনো প্রতিবাদের উত্তরে দক্ষিণপন্থীরা এই সুপরিচিত ত্রিফলা আক্রমণ চালিয়ে থাকেন, যেমন জেএনইউতে গতবছরের আন্দোলনের পরেও করেছিলেন।

কিন্তু ছবিটা একবার উলটো দিক থেকেও দেখে নেওয়া যাক। মনে করুন একটা ধিক্কার মিছিল বেরোলো কাশ্মীরে জঙ্গি হানা, অথবা পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ (যার পেছনে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির প্ররোচনা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশের দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না), অথবা মাওবাদীদের আক্রমণের প্রতিবাদে। আজ যে বাম-উদারপন্থীরা উলটোদিকে আন্দোলন করছেন তাঁরাও কিন্তু তখন সেই পরিচিত বয়ানের বাইরে বেরোবেন না। সেই একই পক্ষপাতী প্রতিবাদ (''গোরক্ষাবাহিনী যখন

তাণ্ডব চালায় তখন তো তোমরা কেউ প্রতিবাদ করো না''), বিকৃত আখ্যান (''শুধু এটা দেখলেই চলবে? কাশ্মীরে বা ছত্তিশগড়ে সরকারী বাহিনী গুলি চালাল বা সারা দেশে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত বলেই তো আজ এটা ঘটল, সেটা তোমরা বিচার করছ না কেন?''), এবং প্রতিবাদীদের নৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা (''পুরোটাই সাজানো, আসলে ওরা সব সঙ্ঘ পরিবারের লোক'') অভিযোগ চলতে থাকবে।

বিরোধীদের যাবতীয় মিটিং মিছিল ও ধর্ণা দেখলেই এই যে তিন রকম সমালোচনা আমরা সবাই করে থাকি, তার মূলে রয়েছে একটিই ধারণা—মানবাধিকার বা ঐ জাতীয় কোনো সর্বজনীন মানবিক নীতির দোহাই দিয়ে ওরা বাজিমাত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বিষয়টা আসলে পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অন্যের একদেশদর্শিতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া বেশ সহজ কাজ, কিন্তু নিজেদের বেলায় আমরা সবাই অন্ধ। অথচ প্রত্যেকেরই কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা মতাদর্শগত একচোখোমি আছে। বাস্তব জগৎকে সাদা চোখে কেউই আমরা দেখি না, দেখি আমাদের বিশ্বাস আর মতাদর্শর রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে। সুতরাং তর্কবিতর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাতে এই মত আর সেই মতে ঠোকাঠুকি লেগে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে একটা মোটামুটি ছবি ফুটে ওঠে যা সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও, অন্তত পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে ধারণা আরেকটু পরিষ্কার হয়। একে অপরের অভিজ্ঞতা জানতে জানতে বিষয়টা সম্পর্কে সবারই জ্ঞান ও উপলব্ধি সমৃদ্ধ হয়। তাতে মূল বিষয় নিয়ে ঐকমত্য না হলেও অন্তত তাতে বিভিন্ন মতপোষণের অবকাশ যে আছে এবং আমার সাথে একমত না হলেই কেউ যে ভয়ানক মন্দ লোক নয়, সেটুকু মেনে নেওয়া যায়।

সেরকম প্রেক্ষাপট না জানলে কে কখন কেন অপরাধী, জঙ্গি, বা নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া বিদ্রোহী নেতা হয়ে উঠল তা বোঝা যাবে না। ঠিক যেমন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো অসুখের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই, সেই আখ্যান অতি আবশ্যক। এবং সেই কারণেই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সমাজ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে এই মারমুখিতার সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। একদিকে যতই পুলিশ মোতায়েন করা হোক আর আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা হোক, বা অন্যদিকে আর্থিক সচ্ছলতার সুযোগ বৃদ্ধি করা হোক, মানুষকে হিংসাত্মক পথ থেকে নিরস্ত করার ব্যবস্থা শুধু আইনি বা অর্থনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে নেওয়া যায় না। ব্রিটিশরা এভাবে উপনিবেশ হিসেবে আমাদের ধরে রাখতে পারেনি, আমরাও বিভিন্ন অঞ্চল এবং গোষ্ঠীর আত্মসম্মান এবং যুক্তরাজ্যের কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বশাসন ও স্বাধীনতার চাহিদা অগ্রাহ্য করে শুধু গায়ের জোরে বা অর্থনৈতিক সচ্ছলতার টোপ দেখিয়ে পারব না।

কিন্তু যে-কোনো ঘটনা নিয়ে আখ্যান কখনই মতাদর্শগতভাবে নিরপেক্ষ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ হতে পারে না, তাতে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত রচয়িতার পক্ষপাত থেকেই যায়। যেমন, ভারতীয় পাঠ্যবইয়ে যে আখ্যান তা হলো ইংরেজ ছিল এক অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশ থেকে সম্পদের নিষ্কাশন। ইংরেজদের পাঠ্যবইয়ে এখনো যে আখ্যান ফুটে ওঠে, তা হলো উপনিবেশবাদের সব দিক নিশ্চয়ই ভালো ছিল না, কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার। একই ঘটনার পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা প্রচলিত থাকা, বা আমার পছন্দের কাহিনিটাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে এই আশা করা খারাপ কিছু নয়, বরং স্বাভাবিকও স্বাস্থ্যকর। সেরকম আমার মতাদর্শে কে খারাপ আর কে ভালো এই ছকের সাথে মেলে এমন কোনো ঘটনায় বেশি বিক্ষুব্ধ হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সব সময়ে এই ছক মিলবে এরকম আশা করাও ঠিক নয়।

অর্থাৎ রাজনীতি যেন খেলার এক ময়দান, যেখানে আমরা সবাই সমর্থক হিসেবে নিজের নিজের দলের পতাকা হাতে ভিড় জমিয়েছি। এই সমস্যা বাম-ডান দুই দিকেই আছে।

দক্ষিণপন্থী রাজনীতির মূল মুদ্রাই হল স্থিতাবস্থাকে সমর্থন করা এবং ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীদের আস্ফালনের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করা, তা সে সরকারি পক্ষপাতপুষ্ট পুঁজিপতিদের কুকীর্তি হোক, পুলিশ-সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘন হোক, পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাত হোক, বা কোনো সংখ্যালঘু বা পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য হোক। এঁদের কাছে খুব নৈতিক অবস্থান আশা করার মানে হয় না। কিন্তু বাম-উদারপন্থী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা বেশি। কিন্তু তাঁরাও অনেক সময়েই এক গোষ্ঠীভিত্তিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন থাকেন, যেখানে দক্ষিণপন্থী কোন দল বা সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে তাঁরা মুখর হন, কিন্তু অন্যথায় তাঁরা, ''এগুলো অপপ্রচার'', ''সব তথ্য জানা নেই'', বা ''কেন হল সেটাও দেখতে হবে'' এই ধরনের যুক্তির আশ্রয় নেন। যেমন, গো-রক্ষকেরা খুন করলে সেটা নিন্দনীয় আর মাওবাদীরা খুন করলে সেটা বিপ্লবী সংগ্রাম; গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অতি-নিন্দনীয়, কিন্তু বাম-সরকারের জমানায় যত হিংসাত্মক ঘটনা, তা অনিবার্য ছিল; আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, বা আফগানিস্থান আক্রমণ করলে সেটা বিপ্লবী কাজ; বাংলায় মন্বন্তরের জন্যে চার্চিল দায়ী, কিন্তু চিনে পঞ্চাশের দশকের শেষে ভ্রান্ত সরকারি নীতির ফলে যে বিশাল মন্বন্তরে এর প্রায় দশগুণ বেশি লোকের মৃত্যু হয়, তাতে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির বা তার নেতৃত্বের কোনো দায়িত্ব নেই, বা এগুলো অপপ্রচার—এইসব দ্বিচারিতার না আছে যুক্তি, না আছে মানবাধিকার রক্ষার প্রতি কোনো আন্তরিক অঙ্গীকার। আছে শুধু গোষ্ঠীভিত্তিক অন্ধ আনুগত্য। এর একমাত্র ফল, বাম-উদারবাদী রাজনীতির যে নৈতিক মূলধন, তার অবক্ষয়।

খেলার উদাহরণে ফিরে বলা যেতে পারে, নিজের দলকে জেতানোর আগ্রহে ভুললে চলবে না যে সব দলেরই একটা সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে—খেলাটা যেন কখনো থেমে না যায়। এবং সেইটা সুনিশ্চিত করতে গেলে সবাই মিলে নজর রাখতে হবে যাতে কেউ নিয়মভঙ্গ না করতে পারে। খেলা ও তার বিভিন্ন দলের সমর্থকদের বৈধতা নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করলে অথবা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে ভাঙচুর শুরু করলে পরাজয়ের গ্লানি থেকে যদি-বা ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পাওয়া যায়, তার পরের ক্ষতিটা হবে আরও ভয়ানক, যেখানে খেলাধুলোর পাট চুকে যাবে। তার যে ক্ষতি সেটা দলমত নির্বিশেষে আমাদের সবার। বাক্‌স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন হলো খেলার নিয়মের মতো—সবসময়ে তার ফলাফল আমাদের মনোমতো হয় না, কিন্তু এগুলো না থাকলে, আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

গণ-হিংসা বা সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গে ফিরে এলে বলতে হয় যে নিশ্চয়ই আমাদের যে-কোনো ঘটনার পটভূমিকা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এর সাথে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি আলাদা করা উচিত, নৈতিক এবং আইনি দুই দিক থেকেই। যাই কারণ থাক, যতই প্ররোচনা থাক, হিংসাত্মক কাজকে সমর্থন করা যায় না। খুনটা খুনই, কক্ষনো অন্য কিছু নয়। সেরকম সন্ত্রাসবাদ, গণহত্যা, আর দাঙ্গা সেটাকে কোন পক্ষে আছে সেই হিসেবে না ঢুকে, প্রথমেই নিন্দা করতে হবে। এসবের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে আমাদের তুই বেড়াল না মুই বেড়াল এই বিতর্কে আটকা পড়ে থাকতে হবে। আর, হিংসা কোনো ক্ষেত্রেই সমর্থনীয় নয় এই অবস্থান না নিলে, হিংসা কার্যত বৈধতা পাবে। আর কোনো-না কোনো দিন সেই হিংসার তাপ আমাদের নিজেদের গায়ে এসে লাগতে বাধ্য। সেই প্রত্যক্ষ ক্ষতি ছাড়া, সেটা নিয়ে প্রতিবাদ করার নৈতিক মূলধনও যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলে কিন্তু সেই পরাজয় সার্বিক হবে। সে এমনই এক অমাময়ী নিশা, যার কোনো ভোর নেই।